দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২১/১০/২০২৩ (পৃষ্ঠাঃ ০১,০২)

১৫ বছরে ধানের ৮০ নতুন জাত

শরীফুল আলম সুমন

- বিআরআরআইয়ের ৬১
- বিনার ১৯
- নতুন জাত স্বল্পস্থায়ী হলেও ফলন বেশি

করোনা মহামারীর পর এখন সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে ভাটা। পরিস্থিতি সামাল দিতে খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিকল্প নেই। এ কাজটিই নিভৃতে করে যাচ্ছেন আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা। গত ১৫ বছরে ধানের ৮০টি নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। দুর্যোগসহনীয় ও আবহাওয়া-উপযোগী উচ্চফলনশীল নতুন ধানের জাতে আমরা খাদ্যোৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এটা আমাদের কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক ও সরকারের সদিচ্ছার ফলে সম্ভব হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে চালের উৎপাদন ছিল ৩১৩ দশমিক ১৭ লাখ টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চালের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪০১ দশমিক ৭৬ লাখ টনে। অর্থাৎ গত ১৫ বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে ৮৮ দশমিক ৫৯ লাখ টন।

মন্ত্রণালয় বলছে, গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, গবেষণা অবকাঠামোর উন্নয়ন, গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং দেশ-বিদেশে বিজ্ঞানীদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ফলে নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। ধানই নয়, ওই সময়ে বৈরী পরিবেশ সহনশীল জাতসহ ৬৯১টি উফশী জাতের ফসল ও ৭০৮টি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও চাল উৎপাদনে তৃতীয় হওয়ার পেছনে রয়েছে সরকারের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট। গবেষণায় বরাদ্দ বেড়েছে, ফলে "বিনা" ভালো ধানের জাত দিতে পারছে। একসময় ব্রি-২৮ ও ২৯ ব্যাপকভাবে চাষ হতো। এর ফলন কমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে একাধিক নতুন ধানের জাত এসেছে। এখন আমরা স্বস্তিকর অবস্থায় আছি। প্রতিবছর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়াচ্ছি।' তিনি বলেন, 'আমরা কৃষকদের জন্য প্রণোদনা অনেক বাড়িয়েছি। সারে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। বীজ সহজলভ্য করা হয়েছে। নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, যার ফল আমরা পাচ্ছি।'

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ধানের ৬১টি জাত উদ্ভাবন করেছে। লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত ৯টি (ব্রি-৫৩, ব্রি-৫৪, ব্রি-৫৫, ব্রি-৬১, ব্রি-৬৭, ব্রি-৭৩, ব্রি-৭৮, ব্রি-৯৭, ব্রি-৯৯), জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু ৩টি (ব্রি-৫১, ব্রি-৫২, ব্রি-৭৯), খরাসহিষ্ণু ৩টি (ব্রি-৫৬, ব্রি-৬৬, ব্রি-৭১), জোয়ার-ভাটাসহিষ্ণু ২টি (ব্রি-৭৬, ব্রি-৭৭), প্রিমিয়ার কোয়ালিটির ৭টি (ব্রি-৬৩, ব্রি-৭০, ব্রি-৭৫, ব্রি-৮০, ব্রি-৮১, ব্রি-৯০, ব্রি-১০৪), জিংকসমৃদ্ধ ৭টি (ব্রি-৬২, ব্রি-৬৪, ব্রি-৭২, ব্রি-৭৪, ব্রি-৮৪, বঙ্গবন্ধু-১০০, ব্রি-১০২) জাত উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৯টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে স্বল্পজীবী বিনা-১৬ ও বিনা-১৭, লবণসহিষ্ণু

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬ >

১৫ বছরে ধানের ৮০

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বোরো ধানের ২টি বিনা-৮ ও বিনা-১০ এবং জলমগ্নতা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু বিনা-২৩ উল্লেখযোগ্য।

কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, দুর্যোগ, ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশে অভিযোজনে সক্ষম আধুনিক লাগসই কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। ৮০টি নতুন জাতের ধানের মধ্যে ১৬টির উৎপাদন ও সফলতা বেশি। প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনে ও সফলতায় পরিবর্তন ঘটছে। উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রি-৪৭, ব্রি-৫৩, ব্রি-৫৪, ব্রি-৬১, বিনা-৮ ও বিনা-১০ চাষে সফলতা বেশি। বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রি-৫১, ব্রি-৫২ এবং খরাপ্রবণ এলাকায় বিনা-৭ ও ব্রি-৩৩, ব্রি-৩৯, ব্রি-৫৬, ব্রি-৫৭ সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু-১০০, ব্রি-১০২, ব্রি-১০৪ জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আছে।

বিনার পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আবদুল মালেক দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'সরকার গবেষণায় অনেক বেশি জোর দিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরাও আন্তরিক। প্রতিবছরই ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হচ্ছে। নতুন জাতগুলোর ফলন যেমন বেশি, তেমনি এগুলো স্বল্পজীবী। আগে দুই ফসল হতো, এখন তিন ফসল হচ্ছে।'

গত ১৫ জুন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাল উৎপাদনে এখনো শীর্ষে চীন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। এরপরই তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ।

ওই মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও খাদ্যবিষয়ক সংস্থা ইউএসডিএর প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে গত এক বছরে চালের উৎপাদন মোট সাড়ে সাত লাখ টন বেড়েছে। ফলে চালের আমদানি কমেছে। ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ ২৬ লাখ ৫০ হাজার টন চাল আমদানি করেছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৮ লাখ টনে নামে। ডলার-সংকটসহ নানা অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে বাংলাদেশ এখন খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে স্বস্তিতে আছে।

সূত্র জানায়, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বিবেচনা করে ভারত, থাইল্যান্ড চাল রপ্তানি বন্ধ রেখেছে। কিন্তু একটি পক্ষ বাংলাদেশ থেকে চাল রপ্তানির জন্য অব্যাহতভাবে চাপ দিচ্ছে। বিশেষ করে অ্যারোমেটিক ও প্রিমিয়ার কোয়ালিটির চাল রপ্তানির জন্য। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ চাল রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের স্বার্থে এনওসি নারাজ হওয়ায় এখন তাদের চক্ষুশূল হতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এত লোকের জন্য চাল উৎপাদনে হিমশিম খেতে হচ্ছে। রপ্তানি শুরু হলে সংকটে পড়তে হবে। অ্যারোমেটিক ও প্রিমিয়ার কোয়ালিটির চালও যদি মজুদ থাকে, তাহলেও ভরসার একটা জায়গা থাকবে।

বিআরআরআইয়ের 'ডাবলিং রাইস প্রোডাকটিভিটি (ডিআরপি) ইন বাংলাদেশ' প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০৩০ সালে দেশে ধানের উৎপাদন ৪০ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন, ২০৪০ সালে ৪৩ দশমিক ৯ মিলিয়ন টন ও ২০৫০ সালে ৪৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন টনে উন্নীত করা সম্ভব। ২০৫০ সালে বাংলাদেশকে আনুমানিক ২১ কোটি ৫৪ লাখ লোককে খাবার জোগাতে হবে। চালের বার্ষিক ব্যবহার এখন জনপ্রতি ১৪৮ কেজি। প্রতিবছর তা ০.৭ শতাংশ হারে কমছে। ২০৪০ সালের মধ্যে জনপ্রতি বছরে ১৩৩ কেজি চাল লাগবে। অন্যদিকে প্রতিবছর ধানের উৎপাদন ০.৩৪ শতাংশ হারে বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়।